# উড়ালগদ্য-৭
## কাজী জহিরুল ইসলাম

## এমন বিজয় কবে অর্জিত হবে?

২০০২ সালে বুশের সাথে হাত মিলিয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার ইরাক আক্রমণ এবং সাদ্দাম হোসেনকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। একথা ভাববার কোনো কারণ নেই যে এ ঘটনাকে ব্রিটেনের সাধারণ জনগন স্বানন্দে মেনে নিয়েছেন। ব্রিটিশরা খুব কায়দা করে পেঁচে ফেলে ক্যাচকি মাইর দেয়, একথা ঠিক কিন্তু ওদের সহনশীলতা পৃথিবীর অনেক দেশের চেয়ে বেশী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে বেশীতো অবশ্যই। ২০০৩-এর আগস্টে আমি যখন একটি কর্মশালায় যোগদানের জন্য নিউইয়র্ক যাই ঠিক সে সময়েই ওয়াশিংটন ডিসিতে বাঙালীদের সবচেয়ে বড় মিলন মেলা 'ফোবানা' অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো। ফোবানায় যোগ দিতে গিয়ে অনেক বাঙালীর কাছে বেশ কিছু মার্কিনী বর্বর নির্যাতনের ঘটনা শুনি। শুধুমাত্র মুসলমান হবার অপরাধে মার্কিনীরা যে মানুষকে কি নির্মম নির্যাতন করেছে তার কিছু নজির তুলে ধরেন কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শি। একটি আট ফুট বাই আট ফুট নিশ্ছিদ্র কামরায় বিনা অপরাধে এবং বিনা বিচারে এক বছর কাটাতে হয়েছে এক বাঙালী মুসলমানকে। শুধুমাত্র সন্দেহের বশে তাকে ধরা হয়েছিলো বলে তিনি জানান। আমার এখনো কেনো জানি মনে হয়, এই কাজটি ব্রিটিশরা করবেন না, যদি না তাদের বর্তমান দোসর (প্রভূও বলা যেতে পারে) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করে থাকে। গত বছরের শেষের দিকে এক নিরপরাধ আর্জেন্টিনিয়কে ব্রিটিশ পুলিশ গুলি করে হত্যা করার পর তারা অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছে। এ জাতীয় বর্বরোচিত ঘটনা ব্রিটেনে খুব সহসাই আর ঘটেছে বলে মনে হয় না। এটি একটি অতি বিরল ঘটনা। মার্কিনীরা যে যুক্তি এবং মানবতার চেয়ে  পেশীশক্তির অধিক পূজারী, তার একটি বড় প্রমাণ হলো গত ২১৭ বছরের ইতিহাসে আজ অব্দি একজনও পেশীশক্তিহীন মানুষ, অর্থাৎ একজন মহিলাকেও প্রেসিডেন্ট হিসাবে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে দেখতে চায় নি ওরা।

যুদ্ধের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন। যে কোনো সময় ইরাক আক্রমণ হবে। টন টন বোমা পড়বে ইরাকের মাটিতে। বাগদাদ পুড়ে তামা হবে, বসরার গোলাপগুলি পুড়ে কয়লা হবে আর তেলের পাইপলাইনগুলি, তেলের খনিগুলি হবে ভয়াবহ অগ্নিকুন্ড। সেই অগ্নিকুন্ডে বেদিশা হয়ে আত্মাহুতি দেবে সাদ্দাম ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা। বুশ-ব্লেয়ারের এই স্বপ্নের রোডম্যাপ আঁকা শেষ। এখন অ্যাকশনে যাবার পালা।

অক্টোবর মাস। ফুরফুরে হাওয়া। আমরা সারাদিন ট্যুরিস্ট কম্পানি 'বিগ বাস'-এর ছাদখোলা গাড়িতে চড়ে ঘুরে বেড়াই। বাকিংহাম প্যালেস, লন্ডন আই, মাদাম তুশোড, মার্বেল আর্চ, লন্ডন টাওয়ার, অক্সফোর্ড স্ট্রিট, ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবে, লন্ডন জু এইসব ঘুরে এসে নেমেছি ট্রাফেলগার স্কয়ারে। লন্ডনে এযাবতকালে যতো বড় বড় মুভমেন্ট হয়েছে তার বেশীরভাগেরই সুতিকাগার হলো এই ট্রাফেলগার স্কয়ার। জায়গাটির ঐতিহাসিক মূল্যের পাশাপাশি সুউচ্চ নেলসনস মার্বেল আর এর গোড়ায় স্থাপিত বিশাল চারটি সিংহমূর্তিসহ অন্যান্য স্থাপত্যশিল্পের নান্দনিক মূল্যও অপরিসীম। ইউরোপীয়রা বলেন, ট্রাফেলগার স্কয়ার না দেখলে লন্ডন দেখাই অসম্পূর্ণ। একথা যে কত বড় সত্যি ট্রাফেলগার স্কয়ারে না গেলে তা অনুমান করা যাবে না। এখন মনে মনে আফসোস করছি অক্সফোর্ড স্ট্রীটের দু'পাশের আকর্ষণীয় দোকানগুলোতে অতোটা সময় নষ্ট না করলেই পারতাম। তাহলে ট্রাফেলগার স্কয়ারে কিছুটা বেশী সময় কাটানো যেতো। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। যত নিরাপদই হোক, শহরটাতো অচেনা। এই অচেনা শহরে

ছোট বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে রাত-বিরাতে বাইরে থাকতে চাই না। নেলসনের মার্বেল খ্যাত সুউচ্চ দন্ডটি এবং এর গোড়ায় স্থাপিত চারটি জায়েন্ট সিংহমূর্তি এই স্কয়ারের কেন্দ্র। মার্বেলের এই বিরল স্থাপত্যশিল্পটির পাশেই রয়েছে একটি মনোরম ঝর্ণা, যেখানে নানান ঢঙয়ে ছলকে উঠে নৃত্য করে পানির ফোয়ারা। অতি মনোহর সেই দৃশ্য। এই ঝর্ণাস্রোতকে ঘিরে বৃত্তাকারে উড়ছে একদল নির্ভয় পায়রা। ওদের ডানার ঘূর্ণনে বিকেলের রোদ স্কয়ারের মার্বেল পাথরের ফ্লোরে আলো-ছায়ার এক অদ্ভুত আঁকিবুকির ঢেউ তুলছে। লক্ষ লক্ষ পায়রা বসে আছে স্কয়ারের এখানে সেখানে। মানুষ আর পায়রার সংখ্যা যেন একে অন্যের সাথে ঈর্ষা করে পাল্লা দিয়ে বেড়েই চলেছে।

ব্রিটিশ অ্যাডমিরাল নেলসন তার স্পেন বিজয়ের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে স্পেনিশ অন্তরীপ ট্রফেলগারের নামানুসারে এই জায়গাটির নাম রাখেন ট্রাফেলগার স্কয়ার। এই স্কয়ারের লে আউট করেন জন ন্যাশ নামক একজন আর্কিটেক্ট ১৯২০ সালে। স্কয়ারের পূর্বপাশের সাউথ আফ্রিকান হাউজে সাজানো আছে প্রস্তরখচিত আফ্রিকান সব জীব-জন্তু। পশ্চিমে কানাডা হাউজ। নরওয়েজিয়ানরা প্রতি বছর একটি বিশাল ক্রিসমাস ট্রি উপহার দেয় ব্রিটিশদের, যেটা রাখা হয় ট্রাফেলগার স্কয়ারে।

রাজা চতুর্থ জর্জ সহ অনেক রাজা-বাদশাহর মূর্তিশোভিত ট্রাফেলগার স্কয়ারে আমরা যখন নিমগ্ন তখন একটা চাপা সমবেত গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছি। গুঞ্জনটা ক্রমশ আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তাকিয়ে দেখি হাজার হাজার মানুষের এক বিশাল মৌন মিছিল। হাতে পোস্টার, প্লাকার্ড, বিশাল বিশাল ব্যানার। বুশ এবং ব্লেয়ারের বিরুদ্ধে নানান রকম কটুক্তিতে ভরা ওসব। আমরা দৌড়ে গিয়ে বিগ বাসে উঠলাম। কিন্তু বিগ বাস তখন অতি ক্ষুদ্র আর আসহায় এই বিশাল জনসমুদ্রের কাছে। নড়বার জো নেই। নড়লেই বুঝি মানুষের পায়ের নিচে পড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাবে। জনসমুদ্রের চেয়ে বড় শক্তি বুঝি আর কিছুই নেই। তাকিয়ে দেখি ট্রাফেলগার স্কয়ারের চতুর্দিক থেকে মিছিল আসতে শুরু করেছে। তার মানে কি? এখানে কি জনসভা হবে? এটা কি পল্টন ময়দান? দেখতে দেখতে পল্টন ময়দান লোকে লোকারণ্য হয়ে গেলো। কারো মুখে কোনো কথা নেই, কোনো গলাবাজি নেই। যা কথা তা লেখা আছে ওই ব্যানারগুলিতে, পোস্টারগুলিতে, প্লাকার্ডগুলিতে আর লক্ষ লক্ষ মানুষের গায়ের টি-শার্টগুলিতে। এই জনসমাবেশে যে শুধু মুসলিম ইমিগ্র্যান্টরাই অংশ নিয়েছিলেন তা কিন্তু না। চেহারা দেখে বুঝেছি হাজার হাজার যুদ্ধবিরোধী শান্তিকামী নেটিভ ব্রিটিশও অত্যন্ত স্বতস্ফুর্তভাবে এই মিছিলে, জনসমাবেশে অংশ নিয়েছিলেন। আমার ইচ্ছে হলো, একটা প্লাকার্ড হাতে নিয়ে ওই মার্বেল দন্ডটির মাথায় উঠে যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমার সংহতির কথা ঘোষণা করি।

বাসের কন্ডাক্টর আমাদের হাতে একটা টিকিট ধরিয়ে দিয়ে বললেন, তোমরা টিউবে চড়ে বাড়ি চলে যাও। আজকের ঘটনার জন্য আমরা দুঃখিত। কম্পানি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তোমরা আগামীকাল সারাদিন বিগ বাসে ঘুরতে পারবে। কোনো পয়সা লাগবে না। এটা আমাদের কম্পেনসেশন। হোটেলে ফিরে বিবিসি খুলে শুনি, দেড় মিলিয়ন লোক যুদ্ধের বিরুদ্ধে, সারা লন্ডন অচল।

গতকাল (২৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৬) আমার আবিদজানের বাসায় বসে সিএনএন দেখছিলাম। হঠাৎ শুনি ব্রিটিশ আদালত লন্ডনের মেয়র কেন লিভিংস্টোনকে পেনালাইজ করেছে। তার অপরাধ তিনি সাংবাদিকের বিরুদ্ধে কটুক্তি করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গর্বে বুকটা উঁচু হয়ে উঠলো। সাংবাদিকতো মানুষের কথা বলেন, মানুষের কথা লেখেন। সাংবাদিকের বিজয় মানে মানুষের বিজয়। মনুষ্যত্বের বিজয়, মানুষের বাক স্বাধীনতার বিজয়। একদিন ওই সাংবাদিকের বিজয়ের মতো দেড় মিলিয়ন লন্ডনবাসী সহ সারা বিশ্বের কোটি কোটি শান্তিকামী মানুষের বিজয় নিশ্চয়ই হবে। লন্ডন সিটি মেয়রের মতো বুশ-ব্লেয়ারেরও শাস্তি হবে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে, লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করার অপরাধে।

পরক্ষণেই হাওয়া বেরিয়ে যাওয়া বেলুনের মতো চিমসে গেলাম। এ বিজয় কি আমার দেশে কোনোদিন অর্জিত হবে? যে দেশে এখনো সত্য কথা লেখার অপরাধে, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কলম ধরার অপরাধে হুমায়ুন কবীর বালু, শামসুর রহমানদের মতো কতো সাংবাদিক অকালে প্রাণ হারায়। যে দেশে মাহফুজ আনাম, মতিউর রহমানদের মতো সিনিয়র সাংবাদিকদের আদালতে ডেকে নিয়ে অপমান করা হয়। সে দেশে এমন বিজয় কবে আর্জিত হবে?

আবিদজান
২৫/০২/০৬